পশ্চিমবংগের শান্তি সম্মেলনে ব্যাপক শান্তি ফ্রণ্ট গঠনের প্রস্তুতি

★ বিভিন্ন বক্তার যুদ্ধের বিরুদ্ধে হুসিয়ারী ★

শান্তি আন্দোলনের বন্যায় যুদ্ধবাজদের মুখোস উন্মোচন

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ. ১৪শ সংখ্যা | বুধবার, ১৬ই মে ১৯৫১, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ | মূল্য—দুই আনা

(নিজস্ব রিপোর্টার)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গভীর ক্ষত চিহ্ন মানুষের মন হতে বিলীন হওয়ার পূর্ব্বেই আবার দুনিয়া জোড়া সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার্থে পৃথিবী ব্যাপি আর একটি যুদ্ধ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সার্ব্বিক প্রস্তুতি গড়ে তুলছে। জনতাকে আমেরিকার কামানের খোরাক করার জন্য চক্রান্ত চলছে।

একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর প্রগতি অস্বীকার করে তার গতি স্তব্ধ করে দিতে চাইছে; অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষ শান্তিকামী সোভিয়েট রুশ, নয়াচীন, পূর্ব্ব ইউরোপের নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতৃত্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রগতির পক্ষে মানুষের বাঁচার লড়াইকে শক্তিশালী করে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলছে। ষ্টকহলমে এই শান্তিরই শপথ নেওয়া হয়েছে। শান্তি মোর্চ্চার এই বিরাট অভ্যুত্থানে একচেটিয়া পুঁজিবাদ আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। তার মুখোস ছিঁড়ে আজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নগ্ন ফ্যাসিবাদ আজ অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, একচেটিয়া পুঁজিবাদের অন্তরালে। তাই, শান্তি সম্মেলনের মাধ্যমে দুনিয়া ব্যাপি যে গণ জোয়ারের ঢেউ সুসংবদ্ধ রূপ নিতে যাচ্ছে, ভীত সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের আশ্রয়ে নিজের নড়বড়ে কাঠামোকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে। সেজন্যই দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তি আন্দোলনের ওপর আঘাত হানছে। শান্তির অগ্রদূতদের visa মিলছেনা, নেতৃবৃন্দেরা গ্রেপ্তার হোচ্ছেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। টুম্যান-এটলি চক্রের জুনিয়ার পার্টনার পণ্ডিত নেহেরু তাই দিল্লীতে প্রস্তাবিত নিখিল ভারত শান্তি কংগ্রেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শান্তিকামী মানুষ আজ যুদ্ধের বিভৎসতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই বোম্বেতে ১১, ১২ ১৩ই মে All India Peace Convention আহুত হয়েছে। বাংলা দেশের শান্তি আন্দোলনের অগ্রগামীরাও তা'র পূর্ব্বেই অতি অল্প সময়ের ভেতর পশ্চিম বাংলা শান্তি সম্মেলন আহ্বান করেছেন। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে বিভিন্ন জেলা হ'তে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এমনকি আসামের ও পাকিস্থানের দশটি জিলা হ'তে ৩১ জন সৌভাত্রমূলক প্রতিনিধি যোগদান করেছেন। বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়ন, কিষাণসভা, জনসংগঠন, ক্লাব, লাইব্রেরী, বুদ্ধিজীবি, মহিলা সংগঠন, মহকুমা শান্তিকমিটি, আঞ্চলিক শান্তি কমিটি এবং বাংলা দেশের প্রতিটি জিলা হ'তে সর্ব্বসমেত ১৬৬১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছেন।

৪ঠা মে সন্ধ্যা ৬টার বহু পূর্ব্বেই কলকাতার মহম্মদ আলী পার্ক জনসাধারণের ভীড়ে বোঝাই হয়ে যায়। যুদ্ধবাজের স্বরূপ প্রকাশ করে শান্তির পক্ষে বিভিন্ন পোষ্টার শোভিত হয়। প্রবেশ দ্বারে বিরাট শান্তি কপোত শোভিত হ'তে থাকে। প্রায় ১২৫ জন সেচ্ছাসেবক সভামণ্ডপের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। ১২,০০০ হাজার দর্শক উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সম্মেলনে যোগদান করেন। এত বিপুল দর্শক সমাবেশে এটাই প্রমানিত হয়েছে, যে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার হাতিয়ার খুঁজছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য্য ধরে যে বিপুল দর্শক সম্মেলনের কার্য্যে যোগদান করেছেন, তা বাস্তবিকই আশার কথা।

বিভিন্ন ধরণের ধ্বনি ও প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে সম্মেলনের কার্য সুরু হয়। সভায় একটি সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হওয়ার পর শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সভানেত্রীত্ব করেন।

চক্ররাই চৌ ট্রয়ার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, "সারা বিশ্বে শান্তির আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছে। পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণের আজ দলমত নির্ব্বিশেষে শাসন শোষণ, অত্যাচার ও যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা উচিত।"

সম্মেলনের সাফল্যকামনা করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে যে অভিনন্দন বাণী প্রেরিত হয়েছে, সভায় তাহা পাঠ করা হয়।

স্বস্তিকা সংঘ ও গণনাট্য সংঘ কর্তৃক শান্তি সংগীত গীত হয়।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক, কমরেড শিবদাস ঘোষ বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করার সংগে সংগে সভায় তুমুল উদ্দীপনা ও উৎসাহ ধ্বনি উত্থিত হয়। তিনি শান্তি সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "দুনিয়া ব্যাপি শান্তি আন্দোলনের বন্যায় জগত যখন চঞ্চল তখন ভারতবর্ষের জনসাধারণও ঘুমিয়ে নেই। সাম্রাজ্যবাদী চক্র পুঁজি বিস্তারের প্রয়াসে গোটা দুনিয়াকে কুক্ষিগত করে মানুষকে অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট করার জন্যে যুদ্ধ চক্রান্ত করছে। যুদ্ধের সমর্থনে জনসাধারণকে টেনে আনার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ গোষ্টির নায়ক আমেরিকা আজ নানা কৌশল অবলম্বন করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট সিংম্যান রীর পেছনে আমেরিকার সক্রিয় সমর্থন কোরিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই সুপরিকল্পিতরূপে জনসাধারণের অজ্ঞাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কোরিয়া যুদ্ধকে অবলম্বন করে সারা দুনিয়ায় সমরানল প্রজ্জলন করাই আমেরিকার লক্ষ্য। তাই, আমেরিকার বাজেটে আজ কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে সামরিক খাতে; পশ্চিম জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে, জাপানকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাই-ওয়ানে অপদার্থ চিয়াংকে সমরসজ্জিত করা হচ্ছে, আন্দুরিয়াতে আক্রমণের পরিকল্পনা চলছে; নয়াচীনকে অর্থনৈতিক অবরোধ করার চেষ্টা চলছে। ইউরোপে মণ্টগোমরী আইসেন হাওয়ার কর্ম্মমুখর।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, "আমাদের "Pacifism এর মোহ নেই। শান্তি আন্দোলনের সমস্ত হাতিয়ার দিয়েও যদি যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা না যায় তবে শান্তি সমাবেশের প্রচণ্ড শক্তি সমন্বয়ে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। কাজেই আমাদের প্রস্তুতি যত ব্যপক আকারে আমরা গড়ে তুলবো; ততই আমাদের শান্তি ফ্রণ্ট শক্তিশালী হবে এবং যুদ্ধবাদীরা তত দুর্ব্বল হবে।"

তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের শান্তি স্থাপনের আন্তরিকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাবী করে বলেন, "যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট সত্যি শান্তির প্রতি আগ্রহশীল হ'ন তবে তাঁরা শান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দাবী মেনে নিন এবং শান্তি আন্দোলনের ওপর থেকে সমস্ত বাধা; নিষেধাজ্ঞা উঠায়ে নিন।"

কমরেড জোগলেকর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব সমস্ত বামপন্থী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা; তিনি ভারতগর্ণমেণ্টের শান্তি বিরোধী কার্য কলাপের নিন্দা করেন।

কমরেড সুধা রায় বলেন, শান্তি সমাবেশের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ চক্রান্তকারীদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ ও শান্তি ফ্রণ্ট শক্তিশালী করা সম্ভব।

কমরেড মিরাজকর বলেন, শান্তিকে চিরপ্রতিষ্ঠাকরার জন্যে দুনিয়ার জন-

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে রুজি, রুটী, ● গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য গণমোর্চা গড়ুন ●

পহেলা মে—সারা বিশ্বের শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক দিবস। আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ দুনিয়ার দেশে দেশের সাম্যবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলি তাদের শ্রেণী সংগ্রামের পথে এই মে দিবসে অতীতের কার্য্যের সমালোচনা করেও নূতন সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী শোষণে নিষ্পেসিত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ অগ্রগামী সর্ব্বহারা শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে মে দিবসের রক্তাক্ত ইতিহাস স্মরণ ক'রে সংগ্রামের শিক্ষা গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত স্বাধীন শ্রমিক রাষ্ট্রে ও জনগণের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মানুষ নিজেদের সমাজতন্ত্রের পথে জয়যাত্রায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরী করে। ১৯৫১ সালের ১লা মে তারিখে তাই আমরাও অগ্রসর হতে চাই ১৮৮৭ সালের আমেরিকার চিকাগো সহরের শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে যাওয়া অভিযানকে স্মরণ করে—সুখী স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ভারত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে।

১৮৮৭ সালে আমেরিকার শ্রমিক ধনিক সরকারের বুলেটের আঘাতে যে রক্ত দেওয়ার পালা সুরু করেছিল—আজও এত বছর পরেও শ্রমিকের সেই রক্তস্নান বন্ধ হয়নি। এখনও আমেরিকা ফ্রান্স ইটালি বৃটেনের শ্রমিক, মালয় বর্ম্মা ইন্দোচীন কোরিয়ার মুক্তিকামী মানুষ বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, ভারতের শ্রমিক কৃষক-কেরানী রক্ত দিচ্ছে কোচবিহারে, গোয়ালিয়রে, কোলকাতায় ও কোয়াদ্বটুরে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের সংগ্রাম করতে গিয়ে—রুটি রুজীর আধকার কায়েম করতে গিয়ে। সেদিন যারা আমেরিকার শ্রমিকের প্রথম সংঘবদ্ধ অভিযান স্তব্ধ করতে গিয়েছিল শুধু বুলেটের জোরে, আজকে তাদেরই পরবর্ত্তী পুরুষেরা ট্রম্যান-ম্যাকআর্থার ও এটলি-চার্চ্চিলেরা সেই পথ বেয়েই চলছে—কোরিয়ায় আগুন জেলেছে, মঞ্চুরিয়ায় বোমা ফেলছে, মালয়ে ও ইন্দোচীনে লক্ষ শহীদের রক্তে মাটি লাল করে দিচ্ছে।

কিন্তু তবুও এতদিনের ইতিহাসে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে—হে মার্কেটের ঘটনার বহু পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়ে, রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হয়ে আজকের পৃথিবী ইতিহাসের নূতন পর্য্যায়ে পৌঁচেছে। দেশে দেশে ধনিক শ্রেণী অনেকদূর অগ্রসর হয়ে বিশ্বপুঁজিবাদের রূপ নিয়েছে, 'প্রগতিশীল ধনতন্ত্র' প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমনাত্মক সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে, পুঁজিবাদ বাকি প্রতিযোগিতার অধ্যায় অতিক্রম করে একচেটিয়া পুজিবাদের স্তরে এসেছে। এক শতাব্দীর ইতিহাসে বিশ্বধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ নিজ নিজ দেশের ও উপনিবেশের শ্রমিক ও জনসাধণের বুকের উপরে শোষণ ও অত্যাচারের রথ চালিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—দুনিয়ার বুকের উপরে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অভিযান চালিয়েছে, ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ও শোষনের ক্ষেত্র দখলের জন্যে, কাঁচামালের ও সস্তা মজুরের দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে দু'বার মানব সভ্যতা ধ্বংসের সর্ব্বাত্মক আয়োজন করেছে। তবুও মানুষের রক্তলোভী সাম্রাজ্যবাদের এখনও রক্ত-পিপাসা তৃপ্ত হয়নি—এখনও সভ্যতা-ধ্বংসী পররাজ্যলোভী পুঁজিবাদ নতুন করে বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন করছে।

কিন্তু আজকের দিনে পৃথিবীতে শুধু সাম্রাজ্যবাদই নয়, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রী রাশিয়াও আছে। পুঁজিবাদের অগ্রগতির সাথে বিশ্ব পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও ধ্বংসের লড়াইও বহুদূর এগিয়েছে। দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হয়েছে, সংঘবদ্ধভাবে দাবী আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্ব্বহারা শ্রেণীর হাতিয়ার মার্কসবাদী দলের শক্তি বেড়ে চলেছে, উপনিবেশে জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম তীব্র হয়েছে ও সর্ব্বোপরি সারা দুনিয়ার সর্ব্বহারা শ্রেণী এক মহান আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ১৮৮৬ সালের রক্তাক্ত ইতিহাস দ্রুততালে অগ্রসর হয়ে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। শুধু তাই নয়; আজকে শুধু শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক আন্দোলনই নয়, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী সশস্ত্র হয়েছে—পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের হামলার মুখোমুখি প্রতিরোধ করছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বিশ্ব-পুঁজিবাদী শক্তিতে প্রথম আঘাত এবং একটি বৃহৎ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল খণ্ডিত হয়েছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে—এশিয়ার সর্ববৃহৎ দেশ চীনে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে চিরকালের মত বিদায় দেবার পথে পা বাড়িয়েছে জনগণ শোষণের শৃঙ্খল ভেঙ্গে জেগেছে।

এইভাবে গত এক শতাব্দীতে বিশ্বপুঁজিবাদ যেমন একদিকে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর আঘাতে মারাত্মকভাবে দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে। মুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি ছাড়া আরও বহু দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছে বিশেষ করে এশিয়ার উপনিবেশে সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধ চলছে।

আজকের ধনতন্ত্র একচেটিয়া (সাম্রাজ্যবাদের) পুঁজিবাদ ও সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর আওতায় বিশ্ব পুঁজিপতি জোট বা ব্লক গঠন করেছে—অগ্রসর দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী ও পরাধীন উপনিবেশের ধনিক শ্রেণী এক স্বার্থে মিলিত হয়ে সম্মিলিত ফ্রন্ট করে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী ও তাঁর রাষ্ট্রগুলি উচ্ছেদের জন্য নূতন বিশ্ব যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্র করছে।

তাই ৬২ বছর পূর্ব্বে প্যারিতে প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে যে মিলিত ধ্বনি উঠেছিল "দুনিয়ার মজুর এক হও, 'শোষনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো' আজকের দিনে আমরা ভারতের শ্রমিক শ্রেণী পৃথিবীর অন্যান্য অংশের শ্রমিক ও জনসাধারণের সাথে এক যোগে আবার আওয়াজ তুলছি—'দুনিয়ার মজুর এক হও, মেহনতী মানুষ শ্রমিকের পাশে দাঁড়াও, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শোষণ, অত্যাচার ও বিশ্ব যুদ্ধ বন্ধ করো—সমস্ত মানুষের জন্য স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করো।"

মে দিবসের এই শপথ নেবার সময়ে বিশেষ ভাবে আমাদের আলোচনা করতে হবে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় সংগ্রাম পদ্ধতি সম্বন্ধে। আন্তর্জাতিক সর্ব্বহারা সংগ্রামের অংশ হিসাবে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণের আজকের সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে, কি প্রতিষ্ঠার জন্যে?

গত ৩।৪ বছরের কংগ্রেসী সরকারের শাসন অবস্থা পর্য্যালোচনা করলেই দেখা যাবে বর্ত্তমানে আমাদের সংগ্রাম কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে। যুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্ব ধনতন্ত্রের সংকটের ফলে এবং দুনিয়া জোড়া গণতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী শক্তির শক্তিবৃদ্ধির ফলে ভীত সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রী জোট গঠনের তাগিদে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর দিকে আপোষের হাত প্রসারিত করে। ধনিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থের তাগিদে, দেশের ভেতরে ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্লবী আন্দোলনের ভয়ে দেশীয় ধনিক শ্রেণীও সাম্রাজ্যবাদের সার্থে আপোষ করে ফেলে। এই ভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় ধনিক শ্রেণীর সমঝউতার ফলেই কংগ্রেসী সরকারের জন্ম, দেশ বিভাগ এবং হিন্দুস্থান পাকিস্থান রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

কংগ্রেসী সরকার স্বাধীনতার নাম দিয়ে রাজ্য চালাতে সুরু করলেও দেখা যায় যে সত্যিকারের স্বাধীনতা কিছুই সে দিতে পারেনি। দেশের সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোনও মৌলিক পরিবর্ত্তনই এর ফলে হলো না। উল্টে জনজীবনে দুঃখ কষ্টের এবং শোষণের বোঝা দ্বিগুণ হয়ে নেবে এলো। দেশের পুরানো কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হলো না, জমীদারী প্রথা টিকে রইলো, চাষীর উপর সুরু হলো জঘন্যতম অত্যাচার—বেশীর ভাগ চাষী দিন প্রতিদিন জমি হারিয়ে ভূমিহীণ হতে লাগল, অতিরিক্ত খাজনা ও সুদে সাধারণ চাষী গরীব থেকে গরীবতর হয়ে গেল—ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন অনুযায়ী ত বাড়লোই না, আরো কমে গেল। দেশের কোন শিল্পই জাতীয়করণ হলো না, বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্ত্তে, নূতন করে বিদেশী মূলধন ভারতের শিল্পে বাণিজ্যে নিয়োজিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হলো। অতিরিক্ত মুণাফা লুটবার জন্য দেশী ও বিদেশী মালিক একযোগে চূড়ান্তভাবে মজুর শোষণ সুরু করল। জাতীয় অর্থনীতির সম্প্রাসরণের পরিবর্ত্তে ঘৃণ্যভাবে বিদেশী পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হলো। কংগ্রেসী সরকার ও মালিক শ্রেণী সৃষ্টি করল দেশ জোড়া বেকারী, মজুর ও কর্ম্মচারী ছাঁটাই, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের অসম্ভব রকম মূল্য বৃদ্ধি। জমিদার শ্রেণী ও চোরাকারবারীর স্বার্থে সৃষ্টি হলো দেশময় দুর্ভিক্ষ, আকাল। এক কথায়

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্থায়ী শান্তি, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য

★ শান্তির শিবিরকে জোরদার করুন ★

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসী সরকার দেশীয় ধণিক স্বার্থে জমিদার শ্রেণীর অনুকুলে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেব দালাল হিসাবে ধনতন্ত্রের সমস্ত সংকটের বোঝা চাপাল মজুরশ্রেণী এবং জনসাধারণের মাথায়।

দেশের জনসাধারণের জীবন হয়ে পড়ল দুর্ব্বিসহ। এই ভীষণ ত্রিবিধ শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল লক্ষ কণ্ঠে ভূয়া স্বাধীনতা ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠল শোষিত ভারতবাসী। কিন্তু পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকার জনসাধারণের দাবী মেটাবার পরিবর্ত্তে স্বরু করল অকথ্য নির্যাতন, চূড়ান্ত অত্যাচার। জনসাধারণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব্ব করল কংগ্রেসী সরকার। হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী বন্দী হলো, গুলি আর লাঠির জোরে রাজ্য চালাতে লাগল কংগ্রেসী সরকার। শুধু অকথ্য দমন নীতিই নয়, বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করে, ভাঁওতা দিয়ে রাজত্ব টিকিয়ে রাখবার প্রয়াস করল নেহেরু সরকার।

কিন্তু শুধু কংগ্রেসী সরকারের দমন আর বিভেদ নীতিই শেষ নয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে আর এক বিপর্য্যয় সৃষ্টি করল দেশের রাজনৈতিক শক্তি। সমাজতন্ত্রের মুখোসধারী জয়প্রকাশী সোস্যালিষ্ট পার্টি তার শ্রেণী স্বার্থ—পুঁজিবাদের সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খোলাখুলি শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধীতা করে, শান্তিপূর্ণ ও আপোষের পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার নাম করে নির্লজ্জভাবে বিশ্বসঘাতকতা করল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি। দেশের প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি করল, নগ্নভাবে মালিক শ্রেণীর দালালী করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মজুরের প্রতিটি দাবীর আন্দোলন পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে নষ্ট করল।

কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বরু করল চূড়ান্ত হঠকারী নীতি। সুবিধাবাদ ও অত্যুগ্র-বাদের সংমিশ্রনে গঠিত শ্রমিক বিরোধী নেতৃত্বে পরিচালিত কম্যুনিষ্ট পার্টি দেশের মধ্যে বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই বিভেদ আরও বাড়িয়ে তুলল। একবার নেহেরু সরকারকে সমর্থন করে পরমুহূর্ত্তেই আবার অপ্রস্তুত অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লব (শ্রমিক শ্রেণী ছাড়াই) স্বরু করে—শ্রমিক শ্রেণীকে করল বিভ্রান্ত—কংগ্রেসী সরকারের দমন নীতি চালাবার মিলল অপূর্ব্ব সুযোগ, ফলে দেশবাসী হয়ে পড়ল বিমূঢ়।

আজকেও তাই দেখা যায় দেশে যখন অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, চাকুরী নেই—বেকার অর্দ্ধাহারে অনাহারে শুকিয়ে মরছে, লক্ষ লক্ষ বাস্তহারা দেশবাসী গৃহহারা সর্বহারা, তখন জনসাধারণ কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করলেও কোন বলিষ্ট আন্দোলন করতে পারছে না। কংগ্রেসী সরকারের প্রতি মোহ নেই অথচ বিপ্লবী আন্দোলনেও তেমন আস্থা নেই, একটা অদ্ভুত রকমের জড়তায় অচ্ছন্ন হয়ে আছে দেশবাসী। তাই এই মে দিবসে আমাদের কাছে আজ সর্বপ্রধান দায়িত্ব এসেছে—জনসাধারণকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করা—সমস্ত রকম বিভেদ বিভ্রান্তি ও ভাঙ্গন বন্ধ করে বলিষ্ঠ ঐক্য গড়ে তোলা।

তাই আজকে নূতন করে সঙ্কল্প নিতে হবে। মে দিবসের সংকল্প দেশব্যাপী বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। প্রতিটি গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং একক সংগঠন গড়ে তোলা। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় টি, ইউ, সির এবং দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ পরিচালিত হিন্দ মজদুর সভার বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে এ, আই, টি, ইউ, সি ও ইউ, টি, ইউ, সিকে এক করা, প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের আওতায় সাধারণ শ্রমিককে ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে মুক্ত করা। কিষাণ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনিভাবেই কিষাণ সভা ও সংযুক্ত কিষাণ সভা একত্রে গড়ে তোলা। এইভাবে ছাত্র, যুব, নারী আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলাই আজকের দাবী।

এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হলো দেশব্যাপী সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা। এই মোর্চা গড়ে তুলতে গিয়ে মনে রাখতে হবে ঐক্যের সর্বনিম্ন ভিত্তি (বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে) হচ্ছে—দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি—সাম্রাজ্যবাদ এবং গ্রামা অঞ্চলের সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিলিত হওয়া। এই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে জমিহীন ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও মধ্যবিত্ত এবং সহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণী ও জনগণের অংশকে খুব সহজেই ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। কংগ্রেসী সরকারই আজ প্রত্যক্ষভাবে দেশীয় পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করছে সুতরাং এই আন্দোলন কংগ্রেসী সরকার উচ্ছেদেরই আন্দোলন হবে—জনসাধারণের জীবনে প্রতিটি আঘাতের বিরুদ্ধে, জীবন ধারণের মানের উপর অসম্ভব চাপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর মজুরি বৃদ্ধি ও চাকুরীর দাবীতে, দেশের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের দাবীতে এবং সর্বোপরি অন্ন বস্ত্র গৃহ প্রভৃতির দাবীতে এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলবে। মনে রাখতে হবে এই ফ্রন্ট শুধু নির্বাচনী দ্বন্দ্বের জন্যই নয়—নির্বাচনী দ্বন্দ্ব ফ্রন্টের একটা কার্য্যক্রম মাত্র—কিন্তু এর আন্দোলনের গণ্ডী ও স্তর বাড়াতে বাড়াতে, মজুর, কিষাণ ও অন্যান্য শোষিত অংশের শ্রেণী ঐক্যের প্রতিষ্ঠার মারফৎ, বিভিন্ন দল ও গ্রুপের মধ্যে গভীরতর ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে আন্দোলনকে পুঁজিবাদী সরকার উচ্ছেদের আন্দোলনে নিয়ে যেতে হবে।

এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনেও নেতৃত্ব করতে পারে. যদি আমরা ফ্রন্টকে ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারি। কেননা আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মনে রাখতে হবে—যে আজকের দিনে যুদ্ধ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলন দেশের ভেতরকার গণতান্ত্রিক অধিকার, মজুরী বৃদ্ধি, চাকুরী রক্ষা ও মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে এক। বিশ্ব ধনতন্ত্র যুদ্ধের আয়োজনে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপরে ক্রমবর্দ্ধমান চাপ বাড়াচ্ছে, ধনিক সরকারকে চূড়ান্ত স্বৈরাচারী করে তুলছে। তাই যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলন আর গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আন্দোলন বিচ্ছিন্ন নয়।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়তে গিয়ে আজকের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে আর একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে। বিভিন্ন পার্টি বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট পার্টিও আজকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা বলছেন—কিন্তু কার্যতঃ দেখছি তাদের কার্য্যকলাপ এখনও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়তে সাহায্য না করে ক্ষতিই করছে। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে—দেশজোড়া আন্দোলন সৃষ্টি করতে। সমস্ত সমস্যা, সমস্ত দাবী এবং ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টই আন্দোলন বাড়িয়ে তুলবে—আর এর ভেতরে সংঘবদ্ধ সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ও শক্তি ফ্রন্টকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করবে। এই ফ্রন্টের আওতার বাইরে থেকে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা আন্দোলন করা হয় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বে, বা ফ্রন্টের বাইরে থেকে বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটি স্থাপিত হয়, তবে এই সব কার্য্যাবলিতে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে অস্বীকার করা হয়, একে দুর্বল করা হয়। এতে সর্বভারতীয় ফ্রন্টের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে তা একটা কাগজী সংগঠন মাত্র হয়ে পড়বে। ঐক্য হবে সেই সমস্ত শ্রেণীর ও অংশের যাদের আন্দোলনের ভূমিকা আছে, আন্দোলনের ব্যাপ্তি হবে দেশজোড়া।

মে দিবসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করার শপথই আমাদের সবচেয়ে বড় সংকল্প।

বিহারে এস, ইউ, সি নেতা কমরেড্ হীরেন সরকার গ্রেপ্তার

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গত ৫ই মে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিহার প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ও সিংভূম জিলার বিশিষ্ট কিষাণ নেতা কমরেড হীরেন সরকার এবং সিংভূম জিলার কিষাণ কর্মী কমরেড ভূদেব সীট বিহার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। ঐ দিন সকাল ৯ ঘটিকায় পুলিশ, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সিংভূম জিলা কমিটির দপ্তর ও জিলা কিষাণ সভার অফিস, খানাতল্লাসী করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কমরেড সরকার আগামী ২০শে ও ২১শে মে ঘাটশীলায় সিংভূম জিলা কিষাণ সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ চালাইতেছিলেন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কাদের স্বার্থে পরিচালিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাদী মহল আর এক মহাযুদ্ধ বাধাতে চায়—বাধাতে চায় অসম্ভব মুনাফার পাহাড় তুলবার জন্য, অন্যান্য দেশগুলির স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুদ্ধবাজরা সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, নিজেদের আক্রমণাত্মক নীতির একান্ত অভাবেই যন্ত্রে পরিণত করবার মতলবে আছেন। এই কথা বিশেষ করে বলা যায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে (আই-এম-এফ) ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের (আই বি-আর-ডি) ব্যাপারে। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন-উডসএ অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক আর্থিক ও অর্থ-নৈতিক সম্মেলনে—ঐ দুই সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ-দান করেছিলেন।

সনন্দ অনুসারে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সভ্যরাষ্ট্রগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া যাতে করে তারা বিনিময় হার ও হিসাবনিকাশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে সভ্য-রাষ্ট্রগুলির জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা এবং অপর সংগঠনের দেওয়া ঋণ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা।

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা গেল, উক্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন দুটীর জন্ম-লাভের পর থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা উভয় সংগঠনকেই নিজেদের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলার চেষ্টা করছেন।

সভ্য-দেশগুলির প্রদত্ত চাঁদার অর্থ দিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের অর্থসম্পদ। অর্থ-ভাণ্ডারের মোট সম্পদ হচ্ছে ৮শ কোটী ডলার। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ সবচেয়ে বেশী (২৮০ কোটী ডলার) এবং তার পরই বৃটেন (১৩০ কোটি ডলার)। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমান ৮৮০ কোটি ডলার—চাঁদার পরিমান অনুসারে সভ্য দেশগুলির মধ্যে শেয়ার ভাগ করে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কের বেলায়ও সব চেয়ে বড় অংশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (৩২০ কোটি ডলার)। এবং তার পরেই বৃটেনের (১৩০ কোটি ডলার)। মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে সব চেয়ে বড় চাঁদাদানকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোট নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যথাক্রমে শতকরা ৩০ ও ৩৪ ভাগ। মনে রাখতে হবে যে, অর্থ-ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের সভ্য দেশগুলি কম-বেশী মার্কিন মূলধনের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং মার্কিন প্রতিনিধিদের আদেশ-নির্দ্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এইভাবে ওয়াল ষ্ট্রিটের তল্পিবাহক মার্কিন গভর্ণমেণ্ট আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তাকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির বাহন করে তুলতে সক্ষম হল। অর্থভাণ্ডার বা ব্যাঙ্কের যে কোনো সিদ্ধান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুকূল না হলে অমনি মার্কিন প্রতিনিধিরা তা অগ্রাহ্য করে দিতে পারেন এবং দেন। আবার নিজেদের যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐ দুই প্রতিষ্টানকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নিতেও মার্কিন গভর্ণমেণ্টের বেগ পেতে হয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ব্ল্যাক হচ্ছেন ওয়াল ষ্ট্রিটেরই একজন প্রতিনিধি। ইনি আমেরিকার অন্যতম সুবৃহৎ ব্যাঙ্ক চেজ্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের পূর্বাপর কার্য্যকলাপ থেকেই প্রমাণিত হয়,ঐ দুই সং-গঠনের অনুসৃতনীতি নির্দ্ধারিত অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার স্বার্থে নয়—মার্কিন পুঁজি-পতি গোষ্ঠির স্বার্থে।

পূর্বেই একবার বলা হয়েছে, আনু-ষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ব্যয়ের হিসাবের ভারসাম্য প্রতি-ষ্ঠিত করা। প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির হিসাবের ভারসাম্য দূরে থাকে, তাদের ঘাটতি ক্রমেই বেড়ে চলছে। পুঁজি-তান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে প্রতিকূল লেন দেন কায়েক হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে এ দেশগুলি যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে পারে তাদের প্রতি-কূল বাণিজ্য বাবদ অধিক অর্থ প্রদানের পরিমাণ তার চেয়ে ঢের বেশি।

ইউরোপ থেকে আমদানীর পরিমাণ না বাড়িয়ে ইউরোপে নিজের পণ্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় দেশগুলিতে এক কৃত্রিম ডলার ঘাটতির অবস্থা সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের পরবর্তী প্রথম চার বছরে আমে-রিকার আমদানীর অপেক্ষা তার রপ্তানীর পরিমাণ ২ হাজার ৬শ কোটী ডলার। এর পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের সোনা ও ডলার মজুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মুদ্রানীতিক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার জন্যে ঐসব দেশ আরো বেশী করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কার্য্যকলাপ থেকেই বোঝা যায়, বিভিন্ন মুদ্রার সুস্থ অবস্থা বিধানের জন্য কিছুই করা হয়নি। সকলেরই জানা আছে, ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ তাহার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে এবং এই মূল্য হ্রাসের ব্যাপারে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ক্রীড়নক আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ঐ দেশগুলির উপর যথেষ্ট চাপ দিতে কসুর করে নি।

ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের উপর মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ সব দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশের জন্যে নিজের পক্ষে অতীব অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে নেয়। ১৯৪৯ সালের মুদ্রা মূল্য হ্রাসের প্রকৃতি থেকে একথা সপষ্ট হয়ে ওঠে। একথা কারো অজানা নেই যে, সাধারণত কোনো মুদ্রার যখন মূল্য হ্রাস ঘটানো হয় তখন মুদ্রা এককের স্বর্ণ-বস্তুরও হ্রাস ঘটে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের মুদ্রা মূল্য হ্রাসে তা হয় নি। বিভিন্ন একক বা ইউনিটের দর কমানো হয়েছে ডলারের অনুপাতে। অর্থাৎ ডলারের সঙ্গে বিনিময় করতে গিয়ে ষ্টার্লিং, ফ্রাঙ্ক, টাকা ইত্যাদি মুদ্রা আগের চেয়ে কম ডলার পেতে লাগল। ডলারের লেজড়ধরা মুদ্রাগুলির বিনিময় হারের হ্রাস ঘটার ফলে মার্কিন পুঁজিপতি গোষ্টীর পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ এল, বিদেশে কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয় করা (অতি সস্তা দরে) সম্ভব হল, সস্তায় মজুর পাওয়ার পথ আরো খোলসা হয়ে গেল। এই সঙ্গে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের কল্যাণে শ্রমজীবি জনগণের জীবন যাত্রার মান হল নিম্নাভিমুখী।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কও ওথলি ষ্ট্রীটেরই এক বাহন এবং মার্কিন পররাজ্যগ্রাস নীতিরই এক পরিপোষক মাত্র। কোন্ কোন্ দেশ ঋণ পেয়েছে সেই থেকেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়াকে ঋণ মঞ্জুর করা হয় নি, যদিও ঋণ চেয়ে তারা সবার আগে আবেদন করেছিল ঐ দুটি দেশ তাদের দলে। অথচ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক সানন্দে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে ঋণ মঞ্জুর করেছে। এ দুটি দেশ ঔপনিবেশিক যুদ্ধে লিপ্ত—হল্যাণ্ড যুদ্ধ করেছে ইন্দোনেশিয়ায়, আর ফ্রান্স ইন্দো-চীনে। লোকায়ত্ত নরাগণতন্ত্রগুলিকে ঋণ না দেওয়ার অজুহাত দেখান হয়েছে এই বলে যে, তারা "মার্শাল পরিকল্পনা" মেনে নেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারছেন, আমেরিকার স্বার্থ পরিচালিত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক গণতান্ত্রিক ও শান্তিশালী দেশগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন অভিযানের একটি যন্ত্র মাত্র!

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর করে যে-যে সর্ত্তে ও যে উদ্দেশ্যে তা থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায়, এই আন্তর্জাতিক সংগঠন সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই স্বার্থ সাধনের বাহন মাত্র। ১৯৪৭ সালের মে মাসে ফ্রান্সকে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থেকে ২৫ কোটি (পঁচিশ কোটি) ডলার ঋণ দেওয়া হল তখনই, যখন তৎকালীন ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার রামাদিয়ার ওথাল ষ্ট্রীটের দাবির কাছে মাথা নত করে তাঁর গভর্ণমেণ্ট থেকে কমুনিষ্টদের বহিষ্কৃত করেন। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে হল্যাণ্ডকেও এক মোটা ঋণ দেওয়া হয়—১৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে দস্যুতার অভিযান চালাচ্ছিলেন তাকে সাহায্য করার জন্যেই ঐ বিপুল পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রদত্তঋণের সর্ত্ত অনুসারে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কী ভাবে সেই অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে তা দেখাশোনা বা খবরদারি করার অধিকারী। যে-যে দ্রব্য আমদানী করা হবে এবং দাম দেওয়া হবে প্রদত্ত ঋণের টাকা থেকে সে সম্পর্কে আগে ভাগেই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কাছে অনু-মোদনের জন্যে এক তালিকা পেশ করতে হয়। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছুই নেই যে, ঋণ গ্রহণকারীকে তার প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগই ব্যয় করতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঋণ তহবিলের ব্যয় নির্বাহের উপর খবরদারি করার ছুতায় ঋণ-গ্রহণকারী দেশগুলির সমগ্র অর্থনীতির উপর আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মোড়লি করার চেষ্টা করে। এই মতলবে ব্যাঙ্ক তার প্রতিনিধিদের অধমর্ণ দেশগুলিতে পাঠিয়ে দেয়। প্রতিনিধিরা সকল রকম তথ্য সংগ্রহ করেন, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে গভর্ণ-মেণ্টগুলি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অব-লম্বনের পরিকল্পনা করেছেন সে বিষয়ে তাঁরা "উপদেষ্টা" হয়ে বসেন এবং প্রয়োজন হলে অর্থ-নৈতিক নীতির পরিবর্তন সম্পর্কেও সুপারিশ জানাতে কসুর করেন না। সোজা কথায়, ঋণগ্রহণকারী দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে আমেরিকানরা অশিষ্টের মতো তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক সহ-যোগিতার প্রতিষ্ঠান নয়। আসলে ও দুটি সংগঠন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বগ্রাসের আক্রমণাত্মক নীতিরই সহায়ক ও পরিপোষক একটি যন্ত্র।

—টাস

ডি, ফোকিন

যতই মতভেদ থাকুক বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সবাই একমত

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সাধারনের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ও ব্যপক গণ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সুসাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শান্তি আন্দোলন স্পষ্ট নীতির ওপর ভিত্তি করে ব্যপক গণ সংযোগের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করলে যুদ্ধ চক্রান্তকারীরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে। যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব জন সাধারনের মনে অঙ্কুরিত হচ্ছে, তাকে বিরাট রূপ দিয়ে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা দরকার। পশ্চিমবংগের শান্তি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের তিনি অভিনন্দন জানান।

এরপর শান্তি সম্মেলনের আহ্বায়ক কমরেড প্রমোদ সেনগুপ্ত সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রস্তাব সূচক খসড়া রিপোর্ট পাঠ করেন। প্রথম দিনের অধিবেশন এইখানে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন বক্তা খসড়া রিপোর্টের উপর অলোচনা চালান। বিভিন্ন মত দেখা দেওয়ায় রিপোর্ট আলোচনা ও বিবেচনা করার জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়. তার সভাপতিত্ব করেন গণদাবীর প্রধান সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জী। তৃতীয় দিনের বৈঠকের প্রারম্ভে কমরেড হিরেন মুখার্জ্জি শান্তি আন্দোলনের মতবাদিক ভিত্তি ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, নূতন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের সংগ্রামের সংগে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ওতঃ প্রোতঃ ভাবে জড়িত। শান্তির মোর্চাকে শক্তিশালী করার জন্যে তিনি জনসাধারণকে উদ্বাত্ত আহ্বান জানান।

প্রবল হর্ষধ্বনির সঙ্গে কমরেড প্রমোদ সেনগুপ্ত জানান যে পঞ্চ শক্তি চুক্তির বার্লিন শান্তি আবেদনে এ পর্য্যন্ত ১, ১১, ৮৫৩টি সাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে।

ত্রিপুরা ষ্টেটের প্রতিনিধি কমরেড গৌরাঙ্গদেব বর্মন ত্রিপুরা শান্তি আন্দোলনে শান্তি কর্মীদের ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টা ও গভর্ণমেণ্টের অগণতান্ত্রিক আচরণের নীতির নিন্দা করেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে সাক্ষর সংগ্রহের সময় একজন শান্তি সেনা কি ভাবে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, তিনি তা বর্ণনা করেন। সভায় তীব্র ঘৃনা সূচক অভিব্যক্তি উত্থিত হয়।

ষ্টিয়ারিং কমিটির সভ্য ও কমিশনের সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জ্জি তাঁহার রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে বলেন. "খসড়া রিপোর্টের আলোচনায় কমিশনে তীব্র মত-দ্বৈধতা দেখা দিয়েছে"। কাজেই তিনি প্রস্তাব করেন যে খসড়া রিপোর্ট সংশোধন প্রস্তাবগুলি সহ সারা ভারত শান্তি সম্মেলনে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য প্রেরিত হোক।

সোসালিষ্ট ইউনেটি সেণ্টারের নেতা কমরেড নিহার মুখার্জ্জিকে তখন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত দেখা দেয়। তিনি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের নিকট প্রস্তাবের বৈষম্য দূর করে একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার অক্লান্ত চেষ্টা করেন। তাঁহাকে ঘন ঘন ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডের জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, বল শেভিক পার্টির তারা দাস, সুধা রায়, কমুনিষ্ট পার্টির বংকিম মুখার্জ্জি এবং আহ্বায়ক প্রমোদ সেনগুপ্তের সংগে আলোচনা করতে দেখা যায়।

এর পর চীন, জাপান, কোরিয়া, সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সংস্কৃতি, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন, শান্তি ও ঔপনিবেশিক চুক্তি, ভারত ও পাক সম্পর্ক, পঞ্চশক্তি শান্তি প্রস্তাব কাশ্মীর এবং সম্মিলিত জাতিসংঘের ওপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চতুর্থ দিনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি ও কমরেড প্রমোদ সেনগুপ্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করে একটি শক্তিশালী শান্তি কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা-মহকুমা-অঞ্চল মহল্লা ফ্যাক্টরী আফিস টেডইউনিয় কিষাণ ও শিক্ষায়তন গুলিতে শান্তি কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। ৪ দিন ব্যাপি সম্মেলনের কাজ চলে। শেষ তিন দিন সভাপতিত্ব করেন হেমন্ত কুমার বসু। ৭ই মে সকাল ৭॥ টায় সংস্কৃতি কর্মীদের এক সমাবেশ হয় এবং শান্তির উপর রচিত প্রাচির পত্র প্রদর্শনী হয়। ৫ই, ৬, ৭ই মে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা হ'তে ১০॥টা পর্য্যন্ত সংস্কৃতি অনুষ্ঠান বিশেষ উৎসাহের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। খ্যাতনামা শিল্পীরা এই সম্মেলনে সেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করেন।

৮ই মে ময়দানে ১০,০০০ হাজার লোকের বিরাট জনসভায় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়।

সভায় সভানেত্রীত্ব করেন, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী।

শান্তি সংগীতের পর সভার কাজ [illegible] সাফল্য কামনা করে যে অভিনন্দন বাণী পাঠানো হয়, সভায় তাহা পাঠ করা হয়। সম্মেলনের বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠ করেন প্রোফেসর জ্যোতি ভট্টাচার্য্য।

কমরেড বংকিম মুখার্জ্জি তাঁর ভাষনে বলেন, একটি বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার পরেও মুনাফাখোরেরা আবার আর একটা বিশ্ব-যুদ্ধ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম ব্যায়িত হচ্ছে ধ্বংশলীলার কাজে। যদি মানুষের শ্রম সমাজের কল্যানের বা প্রগতির সহায়ক না হয়ে, একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, তবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। মানুষকে মারার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ বায়িত হচ্ছে, তা কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চনা করেই সম্ভব হয়।

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জ্জি শান্তি আন্দোলনের আহূত সোভিয়েট রুশ, লালচীন ও নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলোকে ও সারা পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্যে আমাদের সমস্ত দলের সমস্ত বিভেদ ভুলে নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে শান্তি মোর্চা গড়ে তুলে শান্তি সমাবেশ করতে হবে। প্রতিটি শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি ও শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের শান্তির পতাকার নীচে জমায়েৎ করে তুলতে হবে যুদ্ধবাদীদের নগ্ন কোনঠাসা করে পিষে মেরে ফেলার জন্য।

কমরেড বিশ্বনাথ দুবে বলেন, যদিও আজ শান্তি পতাকার নীচে আশানুরূপ শ্রমিক ও কৃষক জমায়েৎ হয়নি তবুও আশা করবো অদূর ভবিষ্যতে দলে দলে পোর্ট, ডক, রেল, কারখানা ও ক্ষেত মজুররা সংঘবদ্ধ হবে যুদ্ধায়োজনকে ব্যর্থ করার জন্যে!

সভায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি, এন সিদ্ধান্ত, হেমন্ত বসু, নন্দদুলাল সিংহ, সুধাংশু ঘোষ, দেবতোষ দাসগুপ্ত, বীরেন দত্ত প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর সভার কাজ শেষ হয়।

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জ্জি আবেদন করেন, "আমরা বিভিন্ন মতাবলম্বী দল একত্রিত হয়েছি শান্তির কর্মসূচীর মাধ্যমে। যতই আমাদের মতভেদ থাকুক, বিশ্বশান্তি রক্ষার বিষয়ে আমরা একমত। সুতরাং এর ভিত্তিতে শান্তি সংগঠনের মারফৎ আমাদের সাধারণ ও সর্ব্ববাদী গ্রহণ যোগ্য প্রস্তাব গ্রহণ করে যেতে হবে। তা করতে পারলে দেখা যাবে অনেক মত বিরোধ কালক্রমে দূরে সরে গিয়েছে। আন্দোলনকে যতই আমরা ব্যপক করবো ততই আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যের দিকে পৌছতে পারবো। তাই বিভিন্নতার ওপর জোর না দিয়ে এখন সাধারণ ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করুন, পশ্চিম বাংলায় দুর্জ্জয় শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলুন"

কমরেড ব্যানার্জ্জির এই [illegible]

সবাই আন্তরিক ভাবে সাড়া দেন।

পাঠকবর্গের প্রতি

কংগ্রেসী দুঃশাসনে প্রতি জিনিষের দামের বৃদ্ধির সাথে সাথে নিউজ প্রিণ্ট কাগজের দামও দিন দিন বেড়ে চলেছে। কাগজের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও আমরা গণদাবীর দাম বাড়াই নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে নিউজ প্রিণ্ট কাগজের দাম গত মাসের তুলনায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমান সংখ্যা গণদাবী প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু পাঠকবর্গের গণদাবীর প্রতি সবিশেষ আগ্রহ জেনে অনেক অসুবিধা সত্বেও গণদাবী প্রকাশ করা হলো।

এ অবস্থায় গণদাবীকে বাঁচাতে হলে দুটী উপায় আছে—হয় গণ-দাবীর পৃষ্ঠা কমান, নতুবা গণদাবীর দাম বাড়ান। এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবর্গের যুক্তিপূর্ণ মতামত পেলে বাধিত হবো।

ম্যানেজার—গণদাবী

৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের

ইংরাজী মুখপত্র

Socialist Unity

৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

বিহারে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া

অসংখ্য লোকের খাদ্যাভাবে মৃত্যু

কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির কল্যাণে ধনীর গোলায় ধান জমা গরীব চাষীর অনাহার

উত্তর বিহারে চূড়ান্তভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকদিনই অনাহার-জনিত মৃত্যুর খবর আসছে। এই কয়-দিন আগেও কংগ্রেসী সরকারের প্রচার বিভাগ বলছিল, না খেতে পেয়ে মরার সংবাদ অতিরঞ্জিত ভিত্তিহীন, এখন কং-গ্রেসের জয়ঢাক তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি এমন কি বিহারের মন্ত্রী-মণ্ডলীও অস্বীকার করতে পারছে না অব-স্থার গুরুত্ব। বিহারে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে সেখানে বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তিই হবে।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক কমপক্ষে ১৮ আউন্স চাল লাগে। এ হিসাব যে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য তা'ও সর্বজন স্বীকৃত। এই অবস্থায় এই নামমাত্র পরিমাণের অর্দ্ধেক ৯ আউন্স করে খেলেও বিহারের প্রয়োজন মাসিক দেড় লাখ টন। সে ক্ষেত্রে তাকে সরবরাহ করা হচ্ছে মাসে ৪৫ হাজার টন। অবশ্য ভারতবর্ষের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী বহুবার ঘোষণা করেছেন বিহারে এই পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে কিন্তু সে ঘোষণা আজও অপূরিত রয়ে গিয়েছে।

একদিকে জনসাধারণ খাদ্যের অভাবে এই নিদারুণ কষ্টে ভুগছে অন্যদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী টাল বাহানা করে চলেছে চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করার ব্যাপারে। মুন্সীজী তো আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন, কেমন করে চীন ও সোভিয়েটের সহিত সম্পাদিত এই চুক্তি বানচাল করা যায়। মার্কিন কর্ত্তাদের দেওয়া লাথি খেতে এই সব মহাপ্রভুর দল প্রস্তুত তবুও সস্তাদরে ভাল খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে দুর্ভিক্ষ দূর করার সদিচ্ছা এদের নেই। জনতার জীবন এই সব কংগ্রেসী নেতাদের কাছে খেলার পুতুল; তারা বাঁচল কি মরল তা চিন্তা করার ফুরসৎই হয় না নেতাদের। বরং খাদ্যদ্রব্য আমদানী না করলে চোরা-কারবারীদের সুযোগ বাড়ে সেইজন্য দুর্ভি-ক্ষের অবস্থা জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বিহারে যে সব চোরাকারবার চলছে তা সরকার পক্ষ ভালভাবেই জানে। সিংভূম ও মানভূম জেলায় খোলাখুলীভাবে কালোবাজারী চালান হচ্ছে। মাঝখানে একবার নির্বাচনী ঘাঁও মারার জন্য চোরা-কারবারীদের ধরপাকড় করার অভিনয় করা হল, তার পর সব ঠাণ্ডা। কালো-বাজারীর দল বেকসুর খালাস পেয়ে আবার আগের মত চোরাকারবার চালাতে লাগল। অভিযুক্ত আসামীদের মন্ত্রীরা হস্তক্ষেপ করে খালাস দিচ্ছেন—এ উদাহরণ বিরল নয়।

আর এ অবস্থা শুধু বিহারে নয়, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই তা চলছে। পশ্চিম বাংলায় চালের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। ৫০৲ ৫৫৲ টাকা প্রতি মণ—বহু যায়গায় বিক্রী হচ্ছে। এই ভীষণ সমস্যাকে পরিকল্পণা অনুযায়ী সমাধানের কোন চেষ্টা না করে মুখে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতার বড় বড় কথা, অধিক খাদ্য ফলাও প্রভৃতি স্লোগান আওড়ান হচ্ছে। ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের মূল কারণ যে এখানকার মান্ধাতা আমলের ভূমি ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে সে কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হচ্ছে। চীনের মত চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে সমস্ত প্রথা ভেঙ্গে চাষীর মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়া ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস চালু করার ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গিয়েছে; আজ চীন উদ্বৃত্ত দেশ। ভারতবর্ষকেও খাদ্যবিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে জমিদারী প্রথার নির্মূল সাধন করে, চাষীর হাতে জমি বিলি করার ব্যবস্থা করতে হবে। পুরাণ কৃষিঋণ মকুব করে দিয়ে বিনা সুদে কৃষককে কৃষিঋণ দিতে হবে, বর্ত্তমানে চড়া খাজনার হার কমিয়ে দিতে হবে, বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে চাষবাস করার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব ব্যবস্থা না করলে ভারতবর্ষ হতে দুর্ভিক্ষ দূর হবে না। দু চার বছর অন্তর অন্তর দুর্ভিক্ষ আসবে আর লাখে লাখে শ্রমজীবি ভারতবাসীর জীবন গ্রাস করবে। যারা এগুলি না করে খাদ্যসমস্যার সমাধান করার কথা বলে তারা আসলে খাদ্যসমস্যার সমাধান চায় না; কৌশলে খাদ্যাভাব টিকিয়ে রেখে চোরাকারবার চালাবার সুযোগ দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস সরকার তা চাইছে। এদের মুখোষ ছিঁড়ে দিতে না পারলে, রাষ্ট্রক্ষমতা হতে এদের হঠিয়ে দিয়ে প্রকৃত জনরাষ্ট্র কায়েম করতে না পারলে স্থায়ীভাবে খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে না। সেই কারণেই তো বাঁচার লড়াই, খাবার লড়াই কংগ্রেস বিরোধী লড়াই এর সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

ভারতীয় গঠণতন্ত্রকে বদল করার চেষ্টা

কাগজে লেখা গঠণতন্ত্রের কথাও ★ নেতাদের অসহ্য ★

জনতার মৌলিক অধিকারের ধারাগুলি তুলে দেবার চক্রান্ত

গণপরিষদে যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে তাকে প্রত্যেকটি সংবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসী নিন্দা করেছেন, জনতার প্রকৃত প্রতি-নিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদই কোন দেশের গঠনতন্ত্র রচনা করার নৈতিক অধিকারি। পুঁজিবাদী দেশে শ্রমজীবি মানুষের, দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ জনের, প্রতিনিধিরা যাতে নির্বাচিত না হতে পারে তার জন্য হাজার রকম বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। তাই পুঁজিবাদী দেশগুলির গঠনতন্ত্র জনস্বার্থ রক্ষাকারি হতে পারে না। তবুও সেখানে কাগজী গণতন্ত্রের মুখোসটি পরা হয়। ভারতবর্ষের বেলায় সে মুখোসটিও নেই। বৃটিশ শাসনের যুগে পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেনীর—দেশের গোটা জনসাধ্যার শতকরা ১২ জনের প্রতিনিধি নিয়ে যে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি গঠিত হয়েছিল তাদের মুখপত্রদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল ভারতীয় গণপরিষদ। তাকে কোন রকমেই, এমন কি ধনিক শ্রেনীর আদর্শ মতেও প্রতি-নিধিমূলক বলা যেতে পারেনা। এহেন গণপরিষদে গৃহীত গঠনতন্ত্র যে জনস্বার্থ বিরোধী হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই একবাক্যে সমস্ত প্রগতিবাদী ভারতবাসী একে ফ্যাসিবাদী গঠনতন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছে।

তবুও মূলদাবী সম্পর্কিত অধ্যায়ে যে সমস্ত কাগজী ভাল কথা ছিল, এবার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী সেগুলিকেও বাদ দেবার ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু পাছে ভারতীয় জনসাধারণ তাঁদের এই ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ করে, তাই ধাপ্পার বহর চলেছে চূড়ান্ত। বোঝাবার চেষ্টা চলেছে —জমিদারী প্রথা প্রভৃতি দূর করতে গিয়ে কতকগুলি আইনগত অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে তাই গঠনতন্ত্রকে পরিবর্ত্তিত করে সে সব অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা যে নিছক ধাপ্পা তা পরিবর্ত্তনের ধারাগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। চার বছর ধরে দেশ শাসনের মধ্যে কংগ্রেস জমিদারী প্রথা বিলোপের কোন কার্য্যকরী চেষ্টা করেনি। যখন হতে হাই-কোর্টের বিচারে বিনা বিচারে আটক রাখা রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্ত হতে লাগল তখন থেকেই কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর চেষ্টা চলতে লাগল কেমন করে তাকে রোধ করা যায়। সেই চেষ্টাই এখন পরিনতি লাভ করতে চলেছে।

গঠনতন্ত্র গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে নিবর্ত্তনমূলক অর্ডিন্যান্স পাস করিয়ে নিয়ে সমস্ত নাগরিক অধিকারের মাথায় লাথি মারা হল। সেই অর্ডিন্যান্সটির আবার নতুন করে মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হল। সাধারণ নির্বাচন আসছে, কংগ্রেসী নেতারা জানে বামপন্থী দলগুলিকে নির্বাচনে লড়ার পূর্ণ সুযোগ দিলে কংগ্রেসের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই যাতে নির্বাচনের সময় বিনা বিচারে বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠরোধ করা যায়, কারারুদ্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করা হল। নিবর্ত্তনমূলক আইন তার প্রথম ধাপ। গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন তার-আর এক-ধাপ। যাতে নিবর্ত্তনমূলক আইনকে ব্যর্থ করে দিয়ে কারারুদ্ধ বামপন্থী কর্মীরা আবার মুক্ত হতে না পারে তার জন্যই গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করছে কংগ্রেসী সরকার।

ইতিমধ্যেই বহুস্থান হতে এই ধরণের বেআইনী কাজের তীব্র প্রতিবাদ উঠেছে। কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ ধীরে ধীরে তার ধারাল থাবা জনতার বুকে বসাচ্ছে। যতদিন যাবে ততই অত্যাচার, নিষ্পেষণ, শোষণ ও সন্ত্রাসন বাড়বে। জাল, জচ্চুরী ধাপ্পা-বাজী ও কালোবাজারীর যে দুঃশাসন এখন চলছে তাকে পাকা পোক্ত করার চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে হবে জনতাকেই। জনসাধারণ কংগ্রেসী কর্ত্তাদের অপকীর্ত্তি সম্বন্ধে সজাগ না থাকলে, অজ্ঞাত মূহূর্ত্তে নতুন নতুন ফাঁস গলায় পড়বে। তাই গোড়া থেকেই সজাগ থাকতে হবে। গণ-তান্ত্রিক দাবী আদায়ের দাবীতে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন সর্বভারতীয় গণমোর্চার নেতৃত্বাধীনে। এই সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ গণশক্তিই কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করে গণরাষ্ট্র কায়েম করতে পারে। তার চেষ্টাই আজকের একমাত্র কাজ। বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলিকে বাধ্য করুণ তাদের দলীয় সঙ্কীর্ণতা কাটাতে, সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী গণমোর্চা গড়ে তুলতে, দেশব্যাপী আন্দোলনের মারফৎ কংগ্রেসী দুঃশাসনের সমাধি রচনা ও গণরাজ কায়েম করতে। যারা এ আহ্বানে সাড়া দেবেনা জানিয়ে দিন তাদের—তারাও কংগ্রেসের মত দেশের শত্রু।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন্ লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।